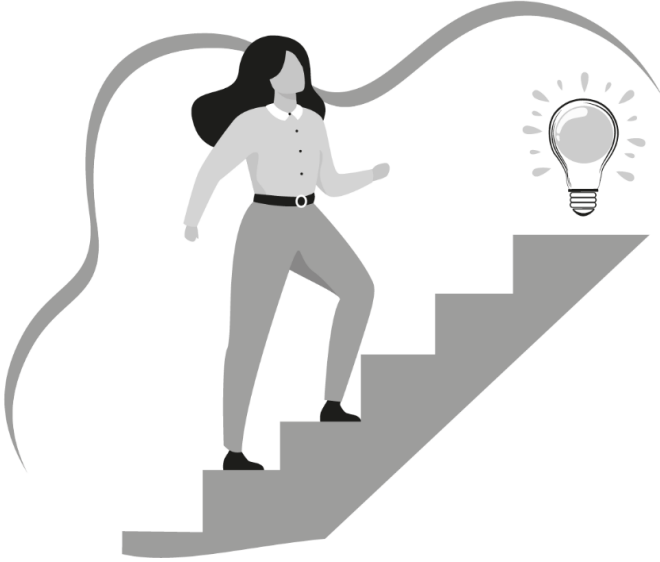


অস্টিন ক্লেয়ন

কির্ষ জোয়িং

১০ ওয়েজ টু স্টে ক্রিয়েটিভ
ইন গুড টাইমস অ্যান্ড ব্যাড



অনুবাদ: মো. ফুয়াদ আল ফিদাহ

প্রকাশ

কিপ গোয়িং

(ভালো... এবং বাজে সময়টাতেও
সৃজনশীল থাকার ১০টি উপায়)

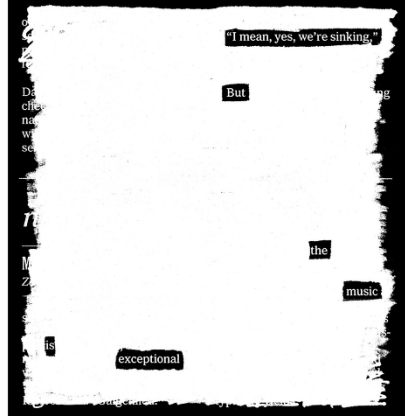
অস্টিন ক্লেয়ন

অনুবাদ

মো. ফুয়াদ আল ফিদাহ

প্রকাশ
ভূমিপ্রকাশ

OVERHEARD ON THE TITANIC



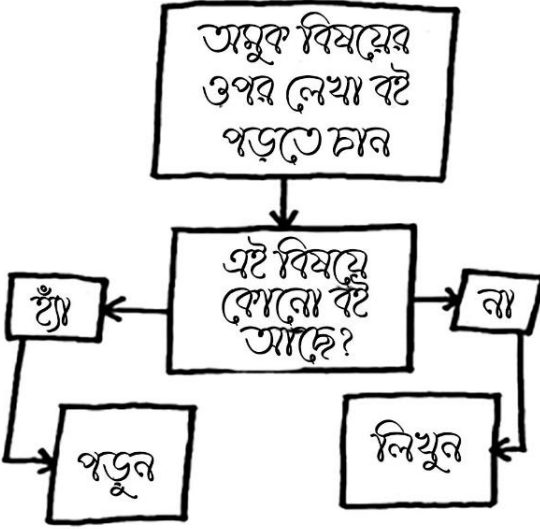
আমার মনে হয়, আমার সৃজনশীলতা ধরে রাখা উচিত; না, কিছু প্রমাণ করার
জন্য নয়, বরঞ্চ এই কারণে যে তাতে আমি আনন্দ পাই...আমার মনে হয়
সৃজনশীল হবার প্রচেষ্টা চালানো, ব্যস্ত থাকা এসব একজন মানুষকে বাঁচিয়ে
রাখায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

—উইলি নেলসন

এই বইটি লিখলাম, কারণ আমার এটা পড়ার দরকার ছিল

বেশ কয়েকটা বছর আগের কথা, প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠতাম, ফোনে দেখে নিতাম শিরোনামগুলো, মনে হতো যেন পৃথিবী রাতারাতি বোকা আর হিংস্র বনে গেছে। এদিকে এক দশকের বেশি সময় ধরে লিখছি আর শিল্প সৃজন করছি, কিন্তু কেন যেন কাজটাকে সহজ হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না। দিনের সাথে পাঞ্জা দিয়ে সেটাই কি হবার কথা ছিল না?

যখন নিজেকে বোঝালাম যে হয়তো কখনই সব সহজ হবে না, ঠিক তখন থেকেই আমার পরিস্থিতির উন্নতি হতে লাগল। পৃথিবীটা পাগলামিতে ভরা। সৃজনশীল কাজ নিঃসন্দেহে কঠিন। জীবন ক্ষুদ্র, কিন্তু শিল্প অনেক... অ-নে-ক দীর্ঘ!



ক্লাস্ত হয়ে পড়েছেন, নতুন করে শুরু করছেন...নাকি প্রচণ্ড সফল হয়েই গেছেন, তাতে কিছু যায়-আসে না; সেই একই প্রশ্ন থেকেই যায়: কীভাবে কাজ চালিয়ে যেতে হয়?

এই বইতে দশটি এমন জিনিসের তালিকা আছে, যা আমার অনেক কাজে এসেছে। লিখেছি মূলত লেখক-লেখিকা এবং শিল্পীদের জন্য, তবে মনে হয় যাদের

ফলপ্রসূ এবং অর্থবহ জীবনযাপন করতে হয় তাদের সবার জন্যই কাজে লাগবে। এর মাঝে আছেন: উদ্যোক্তা, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অবসরপ্রাপ্ত মানুষ এবং সংস্কারক। অনেকগুলো পয়েন্ট আছে, যা আমি অন্যদের থেকে চুরি করেছি। আশা করি আপনারাও চুরি করার মতো কিছু-না-কিছু পাবেন।

বলাই বাহুল্য, ধরাবাঁধা কোনো আইন নেই এইক্ষেত্রে। জীবন মানেই শিল্প, বিজ্ঞান না। তাই প্রত্যেকের যোগ্যতার মাত্রা ভিন্ন। যা আপনার দরকার তা নিয়ে নিন, বাকি সব ভুলে যান।

এগোতে থাকুন, নিজের খেয়াল রাখুন।

আমিও সেটাই করব।

১. প্রত্যেকটি দিনই গ্রাউন্ড হগ ডে! তাই একদিন-একদিন করে এগোব।

‘আমরা কেউই জানি না যে কী হতে যাচ্ছে। তাই সেটা নিয়ে ভেবে সময় খরচ করা অর্থহীন। আপনার সাধ্যানুসারে সবচাইতে সুন্দর বস্তুটি বানান। চেষ্টা করুন প্রত্যেকদিন তাই করতে। ব্যস, হয়ে গেল।’

—লরি অ্যান্ডারসন

যখন কেউ ‘সৃজনশীলতার পথে যাত্রা’-সংক্রান্ত কথাবার্তা বলতে শুরু করে, তখন আমি চোখ উলটে ফেলি।

আমার কাছে কথাটা একটু বেশিই উচ্চাকাঙ্ক্ষী মনে হয়, একটু বেশিই বীরোচিত।

আমার ক্ষেত্রে এই যাত্রাপথটা মাত্র ফুট দশেক—আমার বাড়ির পেছনের দরজা থেকে গ্যারেজের স্টুডিয়ো পর্যন্ত।

ডেস্কে বসে পড়ি, সামনে থাকা খালি কাগজের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ভাবি, ‘গতকালই এই কাজটা করেছিলাম না?’

কাজের মাঝে ডুবে যাই যখন, তখন কিন্তু নিজেকে আমার ওডিসিয়াস মনে হয় না। বরঞ্চ নিজেকে ভাবি আমি সিসিফাস বলে, যে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে তুলছে পাথর। কাজের সময় নিজেকে লুক স্কাইওয়াকার মনে হয় না, মনে হয় গ্রাউন্ডহগ ডে চলচ্চিত্রের ফিল কনার্স বলে!

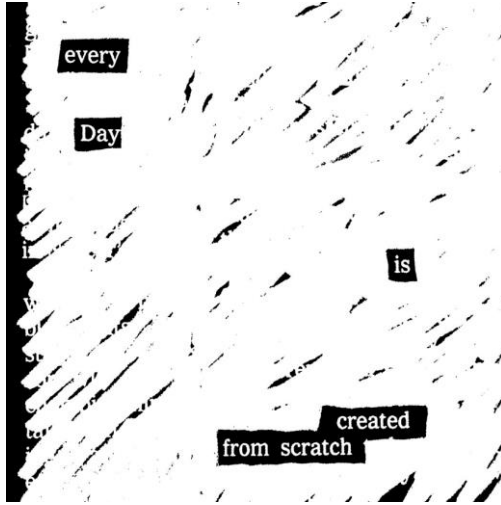
আপনারা যারা এখনও ওটা দেখেননি, কিংবা দেখলেও ভুলে গেছেন তাদের জন্য বলি: ১৯৯৩ সালের কমেডি মুভি ছিল গ্রাউন্ডহগ ডে। মূল চরিত্র, ফিল কনার্স হিসেবে অভিনয় করেছিলেন বিল মারি। ফিল একজন আবহাওয়াবিদ। বেচারি একটা সময়-চক্রে আটকা পড়ে যায়, প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে আবিষ্কার করে: তারিখটা ২ ফেব্রুয়ারি—গ্রাউন্ডহগ ডে—আর সে আছে পেনসিলভেনিয়ার পানসুতওনি-তে। ওটা বিখ্যাত গ্রাউন্ডহগ, পানসুতওনি ফিলের শহর; সে আন্দাজ করতে পারে—শীত আরও হুপ্তা ছয়েক স্থায়ী হবে কি না। আবহাওয়াবিদ ফিলের আবার শহরটাকে একদম সহ্য হয় না, ওর জন্য বনে যায় পারগেটরি। যতভাবে সম্ভব শহর থেকে বেরোবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয় বেচারি। এমনকি ২ ফেব্রুয়ারি পার করে ৩ ফেব্রুয়ারিতেও যেতে পারে না! ফিলের জন্য তাই শীতকালটা যেন

অনন্ত। যা-ই করুক না কেন, ঘুম থেকে উঠে আবিষ্কার করে সেই একই দিনটা আবার ওকে যাপন করতে হবে।

হতাশার একটা পর্যায়ে এসে ফিল একটা বোলিং অ্যালি বারে গিয়ে সেখানে গল্পে ব্যস্ত এক কপোত-কপোতীকে বলে, ‘যদি কোনো একটা জায়গায় আটকে পড়তে যেখানে প্রতিটা দিন একইরকম হয়... আর যাই করো না কেন, তাতে কিচ্ছু আসে-যায় না... তাহলে কী করতে?’

চলচ্চিত্রটার কাহিনি সামনে এগিয়ে নেবার জন্য, ফিলকে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হয়েছে, তবে হ্যাঁ—জীবনকে এগিয়ে নিতে চাইলে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজবে করতে হবে আমাদেরকেও।

আমার ধারণা: উত্তরটা কীভাবে দেবেন, সেটাই আপনার শিল্প।



আমি কোনোভাবেই বলছি না যে থাউন্ডহগ ডে আসলে আমাদের সময়কার সর্বসেরা রূপক-চলচ্চিত্র। হ্যারল্ড রেমিস, মুভিটির ডিরেক্টর এবং সহলেখক, বলেন—অনেক যাজক, র‍্যাভাই, ভিক্ষু তাকে চিঠি লিখেছেন। সেই চিঠিগুলোতে তারা চলচ্চিত্রটির আধ্যাত্মিক বাণীর প্রশংসা করার পাশাপাশি এটাও দাবি করেছেন যে বাণীটি আসলে তাদের নিজ নিজ ধর্মের। তবে আমার মনে হয়, যারা সৃজনশীল কাজ করতে চায়, তাদের জন্য থাউন্ডহগ ডে আলাদা অর্থ বহন করে।

কারণটাও বলি: সৃজনশীল জীবন কোনোভাবেই *সরল* রৈখিক নয়। ক বিন্দু থেকে সরাসরি খ বিন্দুতে চলে আসবেন—তা এক্ষেত্রে হবে না। বরঞ্চ এই জীবনটা একটা চক্র, কিংবা একটা প্যাঁচানো পথ যেখানে প্রতিটা প্রজেক্টের পর আপনাকে

ফিরে আসতে হয় নতুন করে একটা শুরুর বিন্দুতে। আপনি যতই সফল হন কাজে, কিংবা আপনি সফলতার যে স্তরেই আরোহণ করেন না কেন, আপনি কখনই ঠিক ‘তৃপ্ত’ হতে পারবেন না। মৃত্যু ছাড়া একজন সৃজনশীল ব্যক্তির কোনো অবসর কিংবা শেষ রেখা নেই। ‘এমনকি সাফল্যের শিখরে পৌঁছবার পরেও,’ সংগীতজ্ঞ ইয়ান সভেনোনিয়াস বলেন, ‘একেবারে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দলটাও জানতে চাইবে—এবার কী?’

আমি যেসব সত্যিকারের সব্যসাচী শিল্পীদের চিনি তারা এই প্রশ্নের জবাব সবসময় সঙ্গে নিয়ে ঘুরতেন। কেননা তারা নিজেদের জন্য অনুশীলনের প্রাত্যহিক একটা ধারা ঠিক করে নিয়েছিলেন—এমন একটা কর্মপ্রণালী যা তাদেরকে সফলতা, ব্যর্থতা এবং বহির্বিশ্বের বিশৃঙ্খলা থেকে আড়াল করে রাখে। প্রত্যেকেই আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন, কোন কাজের পেছনে নিজের সময়টাকে খরচ করতে চান; এরপর পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, প্রতিদিন সেই কাজ করতে থাকেন। তাদের সাম্প্রতিকতম কাজ সার্বজনীনভাবে প্রত্যাখ্যাত, সমাদৃত কিংবা অবহেলিত—যেটাই হোক না কেন, তারা পরেরদিন উঠে ঠিকই তাদের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

নিজেদের জীবনের ওপর আমাদের বিন্দুমাত্র নিয়ন্ত্রণ নেই বললেই চলে। একমাত্র যে জিনিসটা আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি তা হলো: দিনটাকে কোন কাজে ব্যয় করব...এখন সেই কাজের পেছনে কত বেশি শ্রম দান করব। হয়তো বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছে, তবে আমার আসলেও মনে হয়: শিল্পের জন্ম দিতে চাইলে আপনার যে কাজটা সবচাইতে ফলপ্রসূ হবে তা হলো—নিজের জন্য গ্রাউন্ডহগ ডে-কে নতুন করে সাজানো এবং তাতে নায়কের ভূমিকা পালন করা। গতকাল চলে গেছে, আগামীকাল হয়তো আর কখনও আসবে না। তাই সামনে আছে শুধু আজ এবং আজ আপনি যা করতে সক্ষম তা।

‘যে কেউ মাত্র এক দিনের জন্য যুদ্ধে লিপ্ত হতে পারে,’ টুয়েন্টি ফোর আওয়ার্স নামে নেশা ছাড়তে উদ্যত মদ্যপায়ীদের ধ্যানের ওপর লেখা রিচমন্ড ওয়াকারের একটা বইয়ের প্যারাগ্রাফের শুরু হয়েছিল এভাবে। ‘কিন্তু যখন আপনি-আমি মিলে সেই দুই নির্দয় অনন্তকালকে যোগ করি—অর্থাৎ গতকাল এবং আগামীকাল—তখন আমরা ভেঙে পড়ি। আজকের অভিজ্ঞতা মানুষকে পাগল করে তোলে না। সেই কাজটা করে গতকাল ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনার কারণে তিক্ততা কিংবা তার অনুতাপ...অথবা আগামীকাল যা হতে পারে তার ভয়। তাই আসুন, একদিন একদিন করে বেঁচে থাকার আশ্রয় চেষ্টা করি।’



সৃজনশীলতার পথে যাত্রার তাই কোনো শেষ নেই যেখানে আপনাকে বিজয়ী বীরের সম্মান দিয়ে বলা হবে: এখন সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে থাকো। সত্যিকারে এই পথযাত্রা হলো সেটাই যেখানে আপনি প্রতিদিন জেগে উঠে, ফিলের মতোই, আবিষ্কার করেন যে এখনও অনেক কাজ করা বাকি!

আমরা যেভাবে আমাদের দিন কাটাই, বলাই বাহুল্য যে সেভাবেই আমাদের জীবন অতিবাহিত হয়।
—অ্যানি ডিলার্ড

একটা প্রাত্যহিক রুটিন প্রতিষ্ঠা করুন

হাতের কাজ আর রুটিনের ওপর নির্ভর করাটা শিল্প-প্রতিভা হবার তুলনায় অনেক কম সেক্সি বটে, কিন্তু পাগল হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করতে চাইলে এটাই সর্বসেরা কর্মপদ্ধতি।
—ক্রিস্টোফ নেইম্যান

ভালো দিন যেমন আসবে জীবনে, তেমনি আসবে খারাপ দিন। এমন দিন পাবেন যেদিন উদ্দীপনা আবিষ্কার করবেন নিজের মাঝে, আবার এমন দিনও পাবেন যেদিন মন চাইবে ব্রিজের ওপর থেকে ঝাঁপ দিতে (এমনও কিছু দিন থাকবে যখন এই দুইয়ের মাঝে পার্থক্য করতে পারবেন না)।

প্রাত্যহিক রুটিন থাকলে আপনি দিনটাকে অতিবাহিত করতে পারবেন, এবং সেটাও তার পূর্ণ সদ্যবহার করে! ‘কর্মতালিকা থাকলে বিশৃঙ্খলা আর মর্জির হাত থেকে সুরক্ষা পাওয়া যায়,’ অ্যানি ডিলার্ড লেখেন। ‘দিনকে ধরার জাল বলতে পারেন ওটাকে।’ এরপর কী করবেন তা যখন বুঝতে পারছেন না, তখন কর্মতালিকা আপনাকে তা জানিয়ে দেবে।

যখন হাতে বেশি সময় থাকবে না, তখন কর্মতালিকা বুঝিয়ে দেবে যে সেই স্বল্প সময়টুকু কতটা গুরুত্বপূর্ণ। যখন হাতে প্রচুর সময় থাকবে তখন কর্মতালিকা নিশ্চিত করবে: সময়ের সদ্যবহার করতে সক্ষম হচ্ছেন। নয়টা-পাঁচটার চাকরি করার পাশপাশি আমি লিখেছি, আবার ঘরে বসে পুরোদস্তুর লেখালেখির পেছনেও সময় দিয়েছি; বাচ্চা-কাচ্চার খেয়াল রাখার পাশাপাশি লিখেছি।

এসব পরিস্থিতিতেও লেখালেখি করতে পারার রহস্য হলো: একটা কর্মতালিকা বানিয়ে সেই মোতাবেক সময়কে খরচ করা।

প্রতিদিন:

- একটা ছোট গান শোনো
- একটা ভালো কবিতা পড়ো
- দায়বদ্ধ একটা ছবি দেখো
- কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ বাক্য বলো

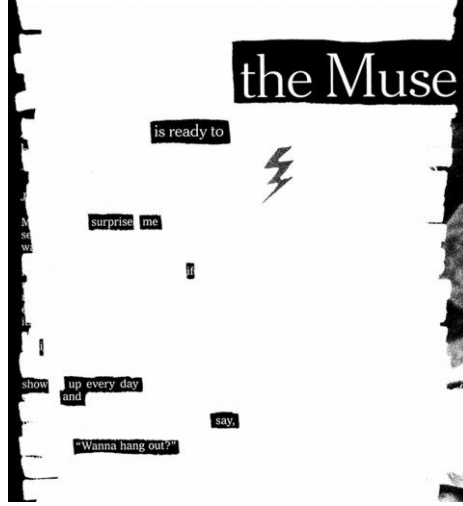
~গ্যোটে

ডেইলি রিচুয়ালস বইতে মেসন কারি মোট ১৬১ জন সৃজনশীল ব্যক্তির প্রাত্যহিক রুটিন লিপিবদ্ধ করেন: কখন তারা ঘুম থেকে ওঠেন, কখন কাজ করেন, কী খান, কী পান করেন, কীভাবে গড়িমসি করেন ইত্যাদি। মানুষের আচরণের উদ্ভট একটা সম্মেলন তুলে ধরেছেন যেন। শুধু এক লেখকদের অভ্যাস নিয়ে পড়লেই মনে হবে যেন কোনো চিড়িয়াখানায় উপস্থিত হয়েছেন! পরিবারের সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর কাফকা লেখালেখি করতেন, প্লাথ লিখতেন সকালে...বাচ্চা-কাচ্চারা জেগে ওঠার আগে। বালজাক দিনে কমপক্ষে পঞ্চাশ কাপ কফি পান করতেন। গ্যোটে শূঁকতেন পচা আপেল। স্টেইনবেক কাজ শুরু করার আগে বারোটা পেন্সিল চেষ্টে নিতেন।

সৃজনশীল মানুষদের রুটিন আর আচার সম্পর্কে পড়া নিঃসন্দেহে মজার, কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ পর বোঝা যায়—সৃজনশীল কাজের কোনো নিখুঁত, সার্বজনীন রুটিন নেই। ‘প্রত্যেক মানুষের প্রাত্যহিক রুটিন মানেই তার বিশেষ কিছু পাগলামি, ছাড় আর কুসংস্কারের সম্মেলন,’ কারি লেখেন। ‘যা তার ভেতরে এসেছে পরীক্ষা-নীরিষ্কার মাধ্যমে এবং যেটা নানা বাহ্যিক প্রভাবের মুখাপেক্ষী।’ আপনার পছন্দের শিল্পীর প্রাত্যহিক রুটিন ধার করে, নিজে কাজে লাগাতে পারার আশা করতে পারেন না। প্রত্যেকের দিনটা নানা ধরনের বাধ্যবাধকতায় পূর্ণ—চাকরি, পরিবার, সামাজিক জীবন—প্রত্যেক সৃজনশীল ব্যক্তির মানসিকতাও ভিন্ন।

নিজস্ব একটা রুটিন খাড়া করাতে চাইলে, নিজেরই দিন আর নিজেরই মানসিকতা আপনাকে মন দিয়ে বিশ্লেষণ করতে হবে। আপনার শিডিউলের ফাঁকা সময়গুলো কখন কখন? কোন কাজটাকে পুরোপুরি বাদ দিলে সময় বের করে আনতে পারবেন? আপনি কি ভোরে ওঠা মানুষ, নাকি নিশাচর? (এমন খুব অল্প কজনকেই দেখেছি যারা বিকেল বেলা কাজ করতে ভালোবাসে। ‘এই সংকর সময়টাকে আমি ঘৃণা করি, না দিন আর না রাত,’ চার্লস ডিকেন্স লেখেন।) সৃজনশীলতার স্রোত কি আপনার মাঝে জন্ম নেয় কোনো হাস্যকর আচার কিংবা কুসংস্কার পালন করার পর? (এই বাক্যগুলো লিখছি পেন্সিল দিয়ে, এমনভাবে রং করা হয়েছে যেন সিগারেটের মতো দেখায়; ওটা বুলছে আমার টোঁটজোড়ার মাঝখান থেকে)। জানি, অনেকের কাছে কড়া রুটিন মানেই যেন জেলখানা। কিন্তু এক হিসেবে কি আমরা সবাই ‘বেড়াজালে বন্দি নই?’ যখন র্যাপার লিল ওয়েইন জেলে ছিলেন, তখন তার প্রাত্যহিক রুটিন দেখে আমার ঈর্ষা হতো। সকাল ১১টায় ঘুম থেকে উঠতেন তিনি, তারপর কফি পান করে ফোন কল করতেন। এরপর গোসল সেবে, ভক্তদের চিঠিপত্র পড়ে, লাঞ্চ খেয়ে আবার ফোন কল সারতেন।

এরপর পড়া, লেখা, ডিনার খাওয়া, পুশ আপে ব্যস্ত হওয়া, রেডিয়ো শোনা, পড়া এবং সব শেষে ঘুম। ‘হায় পোদা, জেলে গেলে সম্ভবত অনেক বেশি লেখালেখি করতে পারতাম!’ বউকে ঠাট্টা করে বলেছিলাম। (পরে যখন আলকাট্রাজে বেড়াতে গেলাম তখন মনে হলো: লেখকদের জন্য নিখুঁত একটা কলোনি হতে পারত। সে কী দৃশ্য!)



কিছুদিনের জন্য বন্দি হলে—বিশেষ করে যদি সেটা স্বেচ্ছায় হয়—তাহলে সম্ভবত আপনি স্বাধীনতার স্বাদ লাভ করবেন। রুটিন আপনার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করে না, বরঞ্চ আপনাকে নিজের জীবনের উত্থান-পতনের হাত থেকে রক্ষা করে বাড়তি স্বাধীনতা দেয়। সীমিত সময়, শক্তি আর প্রতিভাকে আরও ভালোভাবে কাজে লাগাতে সাহায্য করে। রুটিনের মাধ্যমে আপনার ভালো অভ্যাসগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়, এতে করে আপনার সেবা কাজটাও বেরিয়ে আসতে পারে।

সবচাইতে ভালো কাজ হয় তখন, অন্তত আমার মতে, যখন আপনার প্রতিটা দিন মোটামুটি একই ধাঁচে অতিবাহিত হয়; আর যে দিনগুলোর ধাঁচ থাকে আলাদা, সেগুলো আরও কৌতূহলোদ্দীপক হয়ে ওঠে। জেলখানায় অল্প কিছুদিন কাটিয়ে আসার মতো শিক্ষক আর কেউ হতে পারে না...

...কখনও যদি স্কুলেই না যান, তাহলে স্কুল পালাবার মজা বুঝবেন কীভাবে?

‘আমার হ্যাংওভারগুলো এক বছর আগে থেকে স্থির করা।’

—জন ওয়াটারস

তালিকা বানান

দুশ্চিন্তার মাত্রা কমাবার জন্য আমি তালিকা বানাই। যদি করার মতো পঞ্চাশটা কাজের একটা তালিকা করি, তাহলে অদ্ভুত আর ঘ্যানঘ্যানে অনুভূতিটা দূর হয়ে যায়। এই অনুভূতি: অনেক কাজ করা বাকি, অথচ অবস্থা এমন যে-কোনো

মুহূর্তে ভুলে যাবো।

—মেরি রোচ

বিশৃঙ্খল মহাবিশ্বে শৃঙ্খলা আনায়ন করে তালিকা। তালিকা বানাতে দারুণ ভালোবাসি আমি। যখন জীবনকে লাগাম পরাতে চাই, তখন সেই কাজে লেগে পড়ি। মাথার ভেতর ঘুরতে থাকা আইডিয়াগুলো বেরিয়ে আসতে পারে এতে, আর সেগুলো নিয়ে কাজ করতে পারার মতো মানসিক স্থানও পরিষ্কার হয়ে যায়।

যখন অনেক বেশি বিহ্বল হয়ে পড়ি, তখন আশ্রয় নেই বিশ্বস্ত করতে-হবে তালিকার। করা জরুরি, এমন সব কাজের একটা বিশাল তালিকা করি প্রথমেই। তার মাঝে সবচাইতে জরুরি কাজটা খুঁজে বের করে... করে ফেলি। তারপর সেটাকে তালিকা থেকে কেটে দিয়ে, অন্য একটা কাজ বের করি। এভাবেই চলতে থাকে।

আমার অনেক পছন্দের আঁকিয়ে এমন একটা ‘আঁকতে-হবে’ তালিকা বানান। ডেভিড শ্রিগলি এক হপ্তা সময় হাতে রেখে এমন পঞ্চাশটা জিনিসের তালিকা করেন যা তাকে আঁকতে হবে। তালিকা হাতে থাকার মানে: কী করতে হবে তা ভেবে তিনি স্টুডিয়োতে গিয়ে কালক্ষেপণ করেন না। ‘এতগুলো বছরে খুবই সহজ-সরল একটা ব্যাপার শিখেছি। তা হলো: শুরুর একটা বিন্দু ঠিক করা, তারপর কীভাবে কীভাবে সবকিছু যেন আপনা থেকেই হয়ে যায়।’ বলেন তিনি।

লিয়োনার্দো ডা ভিঞ্চি বানাতেন ‘শিখতে-হবে’ তালিকা। সকালে উঠে সেদিন কী কী শিখতে চান, সেটা লিখে ফেলতেন।

যদি এমন কিছু থাকে যা আমি ভবিষ্যতে করতে চাই, কিন্তু এই মুহূর্তে করার মতো সময় নেই, তখন সেটাকে এমন এক তালিকায় যোগ করি যার নাম ‘প্রোডাক্টিভিটি এক্সপার্ট’ ডেভিড অ্যালেন দিয়েছেন: ‘কোনো এক দিন/হয়তো’ তালিকা। লেখক স্টিভেন জনসন একটা তালিকায় লিখে ফেলেন তিনি যাকে আদর করে নাম দিয়েছেন ‘স্ফুলিঙ্গের ফাইল’—যতবার তার মাথায় কোনো বুদ্ধি আসে, তখন তিনি সেটাকে ওটায় যোগ করে দেন; কয়েক মাস পরপর দেখে নেন সেই ফাইল।

কখনও কখনও এমন কাজের তালিকাও করা দরকার যা আপনি কখনই করবেন না। কী পছন্দ করে, এই ব্যাপারে পান্ডা ব্যান্ড ওয়্যার-এর সব সদস্য একমত হতে পারেনি। তবে কী অপছন্দ করে? এই প্রশ্নের জবাবে সবার একই মত। তাই ১৯৭৭ সালে তারা এক হয়ে নিয়মের একটা তালিকা করেন: 'সোলো বাদ, ডেকোরেশন বাদ, শব্দ বেরোনো বন্ধ

হলে থেমে যাবো, আমরা কোরাস করব না, রকিং-ও না, একেবারে সুনির্দিষ্ট কথায় থাকা, আমেরিকানিজম বাদ।' এই তালিকাই তাদের সুরকে নিজস্বতা দান করেছিল।

আমাকে যখন কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হয়, তখন লাভ-ক্ষতির তালিকা বানাই। ১৭৭২ সালে বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করেন তার বন্ধু, জোসেফ প্রিস্টলিকে: 'একটা কাগজের অর্ধেকটা নিয়ে তাতে লাইন টেনে দুই ভাগ করো। এক ভাগে লেখো লাভ, অন্য ভাগে ক্ষতি।' বিয়ে করবেন কি না, এই প্রশ্ন নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েও কিন্তু চার্লস ডারউইন লাভ-ক্ষতির তালিকা বানিয়েছিলেন।

সকালে উঠে যখন আটকে যাই, বুঝতে পারি না যে ডায়ারিতে কী লিখব, তখন লাভ-ক্ষতির তালিকায় পরিবর্তন আনি। কাগজের মাঝখানে দাগ টেনে এই ভাগে লিখি সেইসব বিষয়গুলো যার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। অন্যটায় লিখি সেসব বিষয় যেসবে আমার সাহায্য দরকার। বলা যায়: ওটা আমার প্রার্থনার কাগজ!

'উদ্দেশ্য আছে, এমন সব ব্যাপারের সম্মেলনই তালিকা,' অ্যাডাম স্যাভেজ নামক বিখ্যাত ডিজাইনার লিখেছিলেন। প্রতি বছরের শেষে আমি অতীতের দিকে ফিরে তাকাতে পছন্দ করি, বুঝে নিই যে কী করেছি; তাই আমার সবচাইতে পছন্দের 'সেরা ১০০' ভ্রমণ, জীবনের ঘটনা, বই, রেকর্ড, চলচ্চিত্র ইত্যাদির তালিকা বানিয়ে ফেলি। এই অভ্যাসটা চুরি করেছি কার্টুনিস্ট জন পোরচেঞ্জিনো-



এর কাছ থেকে। তিনি তার ম্যাগাজিন, কিং-ক্যাটে এমন ‘সেরা ৪০’-ধরনের তালিকা দিয়েছিলেন (তিনিও খুব বড়ো মাপের তালিকা-লেখক ছিলেন, বিভিন্ন গল্পের লম্বা সব তালিকা রাখতেন; আঁকার কাজ শুরু করার আগে সেসব দেখে ম্যাগাজিনের জন্য আইডিয়া নিতেন)। প্রতিটা তালিকা যেন একেক বছরের জন্য গোছানো ডায়ারি। আগেকার বছরগুলোর দিকে ফিরে তাকালে আমার ভালো লাগে, বুঝতে পারি যে কী বদলেছে আর কী বদলায়নি।



নিজেকে যখন আধ্যাত্মিকভাবে লাইনে রাখতে হয়, তখন ‘দশ আদেশ’ নিজের মতো করে সাজিয়ে নিই। ‘করা মানা’ আর ‘করতে হবে’-এর তালিকা আরকি! সত্যি বলতে কী, এই বইটাও সেগুলোর একটা।

আপনার তালিকাই আপনার অতীত, এবং আপনার ভবিষ্যৎ। সবসময় নিজের সঙ্গে রাখুন। অগ্রাধিকার নিরূপণ করুন: আজ, এই হপ্তায় এবং হয়তো কখনও—এই কয়টা ভাগে। একদিন মারা যাবেন, সেদিনও আপনার তালিকাটা খালি থাকবে না। তবে এখন, এই মুহূর্তে, যখন বেঁচে আছেন, তখন আপনার নির্ধারিত সময়ের মাঝে কী কী করতে হবে তা ধরতে পারবেন।’

—টম স্যাকস

‘একেকটা দিন শেষ করুন, আর সেটাকে পেছনে ফেলে দিন। যা করতে পারতেন, করে ফেলেছেন। সন্দেহ নেই যে তাতে কিছুটা গন্ডগোল করে ফেলেছেন, কিছু অদ্ভুত ব্যাপারও ঘটে গেছে; কিন্তু যত দ্রুত সম্ভব ভুলে যান ওগুলোর কথা। আগামীকাল নতুন একটি দিন; সেটাকে তাই ভালোভাবে, প্রশান্তচিত্তে শুরু করতে হবে। সেই সঙ্গে যেন এতটাই উদ্দীপ্ত থাকেন যে পুরাতন বাজে ব্যাপারগুলো ধোপে টিকতে না পারে।’

—রালফ ওয়ালডো এমারসন